সংকলিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় ভাগ

সংকলিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বিতীয় ভাগ

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

সংকলিতা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। বাংলা ১২৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য প্রকাশিত হয়, আর 'ছড়ার ছবি'র প্রকাশকাল ১৩৪৪ সাল— প্রায় অর্ধ শতাব্দের ব্যবধান। এই সুদীর্ঘ সময়ে বিষয়বস্তুতে ভাবে ভাষায় ছন্দে কবির রচনায় যে প্রাচুর্য ও যে বৈচিত্র্য প্রকট হইয়াছে তাহার বহু নিদর্শন এই দুখানি সংকলনে একত্র পাওয়া যাইবে; সুকুমারমতি বালক-বালিকাদের ভাষাজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানের উপযোগী হয়, যুগপৎ আনন্দলাভ ও শিক্ষালাভ হয়, এ লক্ষ্য সর্বদাই সম্মুখে রাখা হইয়াছে। ইতি পৌষ ১৩৬১

প্রকাশ : পৌষ ১৩৬১
পুনর্মুদ্রণ : ১৩৬৩, ১৩৬৫, ১৩৬৬, ১৩৬৭, ১৩৬৮, ১৩৬৯
১৩৭০, ১৩৭১, ১৩৭২, ১৩৭৩, ১৩৭৪, ১৩৭৫
অগ্রহায়ণ ১৩৭৬ : ১৮৯১ শক

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭
মুদ্রক শ্রীজয়ন্ত বাকৃচি
পি. এম. বাকৃচি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
১৯ গুলু ওস্তাগর লেন। কলিকাতা ৬
৭.১
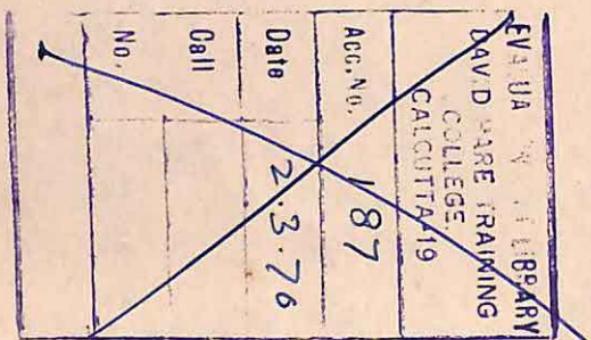
সূচীপত্র

পৃষ্ঠাঙ্ক

নববর্ষের গান ৫
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ৬
কর্ম ৯
পুরাতন ভৃত্য ১০
পণরক্ষা ১৩
স্পর্শমণি ১৫
ভক্তিভাজন ১৭
মস্তকবিক্রয় ১৮
পরের কর্ম-বিচার ২০
আষাঢ় ২১
তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে ২২
শরৎ ২৩
ফাল্গুন ২৫
মাধবী ২৬
ঈর্ষার সন্দেহ ২৭
যোগীনদা ২৮
ভিক্ষা ও উপার্জন ৩৩
নিস্ফল উপহার ৩৪
সামান্য ক্ষতি ৩৭

পৃষ্ঠাঙ্ক

ভোরের পাখি ৪৩

প্রতিনিধি ৪৬

বৈরাগ্য ৫১

* বঙ্গজননী ৫২

* * ভারতলক্ষ্মী ৫৩

মায়ের সম্মান ৫৪

আত্মত্রাণ ৬৪

* এই কবিতায়, চতুর্থ স্তবকের পঞ্চম ছত্রে এবং অন্যান্য স্তবকের তৃতীয় ছত্রে 'মা' শব্দের একটু টানা উচ্চারণ, অর্থাৎ স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ হওয়া দরকার।

* * ইহাতে হ্রস্ব দীর্ঘ স্বরের প্রভেদে উচ্চারণের প্রভেদ আছে, যেমন সংস্কৃত ভাষায় হইয়া থাকে। কিন্তু, সর্বত্র সেরূপ হয় নাই। আসলে রচনাটি গান বলিয়া, সুরে তালে গীত হইলে ইহার ছন্দোদোলের সম্যক্ বোধ হইয়া থাকে।

নববর্ষের গান

হে ভারত, আজি নবীনবর্ষে শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হর্ষে এনেছি পূজার দান।
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ—
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান।

কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।
সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন,
দীনের এ পূজা, দীন আয়োজন—
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধুলা লুটে।
সুরদুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে।

রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।

দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন— তাই আমাদের দিয়ো।
পরের শয্যা ফেলিয়া পরিব তোমার উত্তরীয়।

দাও আমাদের অভয়মন্ত্র অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব।

নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের 'পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে প্রভাতপাখির গান।
না জানি কেন রে এত দিন পরে জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে!
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়—
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।

কেন রে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন,
ভাঙ্ রে হৃদয়, ভাঙ্ রে বাঁধন,
সাধ্ রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর 'পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের 'পরে আঘাত কর্।
মাতিয়া যখন উঠেছে পরান
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ!
উথলি যখন উঠেছে বাসনা
জগতে তখন কিসের ডর!

আমি ঢালিব করুণাধারা,
আমি ভাঙিব পাষাণকারা,

আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া দিব রে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খলখল গেয়ে কলকল তালে তালে দিব তালি!
এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে— প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

কী জানি কী হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ।
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
ওরে চারি দিকে মোর
একি কারাগার ঘোর!
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর্‌।
ওরে আজ কী গান গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর!

কর্ম

ভৃত্যের না পাই দেখা প্রাতে।
দুয়ার রয়েছে খোলা, স্নানজল নাহি তোলা,
মূর্খাধম আসে নাই রাতে।
মোর ধৌত বস্ত্রখানি কোথা আছে নাহি জানি,
কোথা আহারের আয়োজন!
বাজিয়া যেতেছে ঘড়ি, বসে আছি রাগ করি,
দেখা পেলে করিব শাসন।
বেলা হলে অবশেষে প্রণাম করিল এসে,
দাঁড়াইল করি করজোড়।
আমি তারে রোষভরে কহিলাম, 'দূর হ রে,
দেখিতে চাহি না মুখ তোর।'
শুনিয়া মূঢ়ের মতো ক্ষণকাল বাক্যহত
মুখে মোর রহিল সে চেয়ে—
কহিল গদ্‌গদস্বরে, 'কালি রাত্রি দ্বিপ্রহরে
মারা গেছে মোর ছোটো মেয়ে।'
এত কহি ত্বরা করি গামোছাটি কাঁধে ধরি
নিত্য কাজে গেল সে একাকী।
প্রতি দিবসের মতো ঘষামাজা মোছা কত
কোনো কর্ম রহিল না বাকি।

পুরাতন ভৃত্য

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর—
যা-কিছু হারায় গিন্নি বলেন, 'কেষ্টা বেটাই চোর।'
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে!
বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ চীৎকার করি 'কেষ্টা'—
যত করি তাড়া নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে;
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা করে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা।
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা, গাধা'—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্ত,
তবু মায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকো,
রহিল তোমার এ ঘর-দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন; বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেল, শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর?'

শুনে মহা রেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে ;
বলি তারে 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।'
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায় ; পরদিনে উঠে দেখি,
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি—
প্রসন্ন মুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি অকাতর চিত্ত।
ছাড়ালে না ছাড়ে, কী করিব তারে— মোর পুরাতন ভৃত্য।

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন, শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে—
পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম, 'আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে।'
রেলগাড়ি ধায় ; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে—
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত, তামাক সাজিয়া আনে!
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্য!
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য!

নামিনু শ্রীধামে— দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত ;

জন-ছয় সাতে মিলি একসাথে   পরম বন্ধুভাবে
করিলাম বাসা ; মনে হল আশা   আরামে দিবস যাবে।
কোথা ব্রজবালা, কোথা বনমালা,   কোথা বনমালী হরি!
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্ত!   আমি বসন্তে মরি!
বন্ধু যে যতো স্বপ্নের মতো   বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ।
আমি একা ঘরে, ব্যাধিখরশরে   ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ,   'কেষ্ট, আয় রে কাছে।
এতদিনে শেষে আসিয়া বিদেশে   প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে!'
হেরি তার মুখ ভ'রে ওঠে বুক,   সে যেন পরম বিত্ত—
নিশিদিন ধ'রে দাঁড়ায়ে শিয়রে   মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল,   শিরে দেয় মোর হাত ;
দাঁড়ায়ে নিঝুম, চোখে নাই ঘুম,   মুখে নাই তার ভাত।
বলে বারবার, 'কর্তা, তোমার   কোনো ভয় নাই, শুন—
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে   দেখিতে পাইবে পুন।'
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম,   তাহারে ধরিল জ্বরে ;
নিল সে আমার কালব্যাধিভার   আপনার দেহ-'পরে।
হয়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু দিন,   বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে ;   এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহু দিন পরে আপনার ঘরে   ফিরিনু সারিয়া তীর্থ ;
আজ সাথে নেই চিরসাথি সেই   মোর পুরাতন ভৃত্য।

পণরক্ষা

'মারাঠা দস্যু আসিছে রে ওই, করো করো সবে সাজ'
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-প্রহরে যে যাহার ঘরে সেঁকিছে জোয়ারি রুটি,
দুর্গতোরণে নাকাড়া বাজিতে বাহিরে আসিল ছুটি।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া দক্ষিণে বহু দূরে
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধুলা মারাঠি অশ্বখুরে।
'মারাঠার যত পতঙ্গপাল কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি ফিরে নাকো যেন' গর্জিলা দুমরাজ।

মাড়োয়ার হতে দূত আসি বলে, বৃথা এ সৈন্যসাজ।
হেরো এ প্রভুর আদেশপত্র দুর্গেশ দুমরাজ!
সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার ফিরিঙ্গি সেনাপতি—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ বিজয়সিংহ-'পরে।
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড় দিবে মারাঠার করে;
'প্রভুর আদেশে বীরের ধর্মে বিরোধ বাধিল আজ'
নিশ্বাস ফেলি কহিলা কাতরে দুর্গেশ দুমরাজ।

মাড়োয়ার-দূত করিল ঘোষণা, 'ছাড়ো ছাড়ো রণসাজ।'
রহিল পাষাণ মুরতি-সমান দুর্গেশ দুমরাজ।

বেলা যায় যায়, ধূ ধূ করে মাঠ, দূরে দূরে চরে ধেনু—
তরুতলছায়ে সকরুণ রবে বাজে রাখালের বেণু।
'আজমীর গড় দিলা যবে মোরে পণ করিলাম মনে
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে ছাড়িব না এ জীবনে।
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায় ভাঙিতে হবে কি আজ!'
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিশ্বাস দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুত সেনা সরোষে শরমে ছাড়িল সমর-সাজ;
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল পশ্চিম-মাঠ-পারে;
মারাঠি সৈন্য ধুলা উড়াইয়া থামিল দুর্গদ্বারে।
'দুয়ারের কাছে কে ঐ শয়ান? ওঠো ওঠো, খোলো দ্বার'—
নাহি শোনে কেহ প্রাণহীন দেহ সাড়া নাহি দিল আর।
প্রভুর কর্মে বীরের ধর্মে বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গদুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ দুর্গেশ দুমরাজ।

স্পর্শমণি

নদীতীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে
জপিছেন নাম,
হেনকালে দীনবেশে ব্রাহ্মণ চরণে এসে
করিল প্রণাম।
শুধালেন সনাতন, 'কোথা হতে আগমন,
কী নাম ঠাকুর ?'
বিপ্র কহে, 'কিবা কব, পেয়েছি দর্শন তব
ভ্রমি বহু দূর।
জীবন আমার নাম, মানকরে মোর ধাম,
জিলা বর্ধমানে ;
এত বড়ো ভাগ্যহত দীনহীন মোর মতো
নাই কোনোখানে।
জমিজমা আছে কিছু, করে আছি মাথা নিচু,
অল্পস্বল্প পাই।
ক্রিয়াকর্ম-যজ্ঞযাগে বহু খ্যাতি ছিল আগে,
আজ কিছু নাই।
আপন উন্নতি-লাগি শিব কাছে বর মাগি
করি আরাধনা ;
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কন মোরে,
পুরিবে প্রার্থনা—

যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়,
তাঁরে পিতা বলি মেনো, তাঁরি হাতে আছে জেনো
ধনের উপায়।'

শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হন,
'কী আছে আমার ?
যাহা ছিল সে সকলই ফেলিয়া এসেছি চলি,
ভিক্ষামাত্র সার।'
সহসা বিস্মৃতি ছুটে, সাধু ফুকারিয়া উঠে,
'ঠিক বটে ঠিক !
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশ-মানিক।
যদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে
পুঁতেছি বালুতে ;
নিয়ে যাও হে ঠাকুর, দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।

বিপ্র তাড়াতাড়ি আসি খুঁড়িয়া বালুকারাশি
পাইল সে মণি ;
লোহার মাদুলি দুটি সোনা হয়ে উঠে ফুটি
ছুঁইল যেমনি।

ব্রাহ্মণ বালুর 'পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে—
ভাবে নিজে নিজে।
যমুনা কল্লোলগানে চিন্তিতের কানে কানে
কহে কত কী যে।
নদীপারে রক্তচ্ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি
গেল অস্তাচলে ;
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে
কহে অশ্রুজলে,
'যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে মানো না মণি
তাহারি খানিক
মাগি আমি নতশিরে।' এত বলি নদীনীরে
ফেলিল মানিক।

ভক্তিভাজন

রথযাত্রা লোকারণ্য, মহা ধুমধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব'— হাসে অন্তর্যামী।

মস্তকবিক্রয়

কোশলনৃপতির তুলনা নাই, জগৎ জুড়ি যশোগাথা—
ক্ষীণের তিনি সদা শরণ-ঠাঁই, দীনের তিনি পিতামাতা।

সে কথা কাশীরাজ শুনিতে পেয়ে জ্বলিয়া মরে অভিমানে—
'আমার প্রজাগণ আমার চেয়ে তাহারে বড়ো করি মানে!
আমার হতে যার আসন নীচে তাহার দান হল বেশি!
ধর্ম দয়া মায়া সকলই মিছে, এ শুধু তার রেষারেষি।'
কহিলা, 'সেনাপতি, ধরো কৃপাণ, সৈন্য করো সব জড়ো।
আমার চেয়ে হবে পুণ্যবান, স্পর্ধা বাড়িয়াছে বড়ো!'
চলিলা কাশীরাজ যুদ্ধসাজে— কোশলরাজ হারি রণে
রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে পলায়ে গেল দূর বনে।
কাশীর রাজা হাসি কহে তখন আপন সভাসদ্ মাঝে,
'ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন তারেই দাতা হওয়া সাজে।'

সকলে কাঁদি বলে, 'দারুণ রাহু এমন চাঁদেরেও হানে!
লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু, চাহে না ধর্মের পানে!'
'আমরা হইলাম পিতৃহারা' কাঁদিয়া কহে দশ দিক,—
'সকল জগতের বন্ধু যাঁরা তাঁদের শত্রুরে ধিক্।'
শুনিয়া কাশীরাজ উঠিল রাগি— 'নগরে কেন এত শোক?
আমি তো আছি, তবু কাহার লাগি কাঁদিয়া মরে যত লোক!

আমার বাহুবলে হারিয়া তবু আমারে করিবে সে জয় !
অরির শেষ নাহি রাখিবে কভু, শাস্ত্রে এইমতো কয়।
মন্ত্রী, রটি দাও নগর-মাঝে, ঘোষণা করো চারি ধারে—
যে ধরি আনি দিবে কোশলরাজে কনক শত দিব তারে।'
ফিরিয়া রাজদূত সকল বাটী রটনা করে দিন রাত।
যে শোনে আঁখি মুদি রসনা কাটি শিহরি কানে দেয় হাত।

রাজ্যহীন রাজা গহনে ফিরে মলিনচীর দীনবেশে—
পথিক একজন অশ্রুনীরে একদা শুধাইল এসে,
'কোথা গো, বনবাসী, বনের শেষ ? কোশলে যাব কোন্ মুখে ?'
শুনিয়া রাজা কহে, 'অভাগা দেশ, সেথায় যাবে কোন্ দুখে ?'
পথিক কহে, 'আমি বণিক্ জাতি, ডুবিয়া গেছে মোর তরী,
এখন দ্বারে দ্বারে হস্ত পাতি কেমনে রব প্রাণ ধরি !
করুণাপারাবার কোশলপতি, শুনেছি নাম চারি ধারে—
অনাথনাথ তিনি দীনের গতি, চলেছে দীন তাঁরি দ্বারে।'
শুনিয়া নৃপসুত ঈষৎ হেসে রুধিলা নয়নের বারি,
নীরবে ক্ষণকাল ভাবিয়া শেষে কহিলা নিশ্বাস ছাড়ি,
'পান্থ, যেথা তব বাসনা পুরে দেখায়ে দিব তারি পথ।
এসেছ বহু দুখে অনেক দূরে ; সিদ্ধ হবে মনোরথ।'

বসিয়া কাশীরাজ সভার মাঝে ;   দাঁড়ালো জটাধারী এসে।
'হেথায় আগমন কিসের কাজে'   নৃপতি শুধাইল হেসে।
'কোশলরাজ আমি বনভবন'   কহিলা বনবাসী ধীরে—
'আমার ধরা পেলে যা দিবে পণ   দেহো তা মোর সাথিটিরে।'
উঠিল চমকিয়া সভার লোকে,   নীরব হল গৃহতল ;
বর্ম-আবরিত দ্বারীর চোখে   অশ্রু করে ছলছল।
মৌন রহি রাজা ক্ষণেক-তরে   হাসিয়া কহে, 'ওহে বন্দী,
মরিয়া হবে জয়ী আমার 'পরে   এমনি করিয়াছ ফন্দি ;
তোমার সে আশায় হানিব বাজ,   জিনিব আজিকার রণে—
রাজ্য ফিরি দিব হে মহারাজ,   হৃদয় দিব তারি সনে।'

জীর্ণ-চীর-পরা বনবাসীরে   বসালো নৃপ রাজাসনে,
মুকুট তুলি দিল মলিন শিরে—   'ধন্য' কহে পুরজনে।

পরের কর্ম বিচার

নাক বলে, 'কান কভু ঘ্রাণ নাহি করে,
রয়েছে কুণ্ডল দুটো পরিবার তরে।'
কান বলে, 'কারো কথা নাহি শুনে নাক,
ঘুমোবার বেলা শুধু ছাড়ে হাঁক-ডাক।'

আষাঢ়

নীল নবঘনে আষাঢ়গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।
বাদলের ধারা ঝরে ঝরোঝরো,
আউশের ক্ষেত জলে ভরো-ভরো,
কালী মাখা মেঘে ও-পারে আঁধার
ঘনিয়েছে দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

ওই ডাকে শোনো ধেনু ঘন ঘন,
ধবলীরে আনো গোহালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ওগো দেখ্‌ দেখি
মাঠে গেছে যারা তারা ফিরিছে কি।
রাখাল-বালক কী জানি কোথায়
সারাদিন আজি খোয়ালে।
এখনি আঁধার হবে বেলাটুকু পোহালে।

শোনো শোনো ওই পারে যাবে ব'লে
কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।

খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পুবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দু-কূল বাহিয়া উঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল
ছলছল উঠে বাজি রে।
খেয়া-পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।

ওগো, আজ তোরা যাস নে গো তোরা
যাস নে ঘরের বাহিরে।
আকাশ আঁধার, বেলা বেশি আর নাহি রে।
ঝরঝর ধারে ভিজিবে নিচোল,
ঘাটে যেতে পথ হয়েছে পিছল,
ঐ বেণুবন দুলে ঘন ঘন
পথ পাশে দেখ্‌ চাহি রে।
ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে।

তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে

গন্ধ চলে যায়, হায়, বন্ধ নাহি থাকে ;
ফুল তারে মাথা নাড়ি ফিরে ফিরে ডাকে।
বায়ু বলে, 'যাহা গেল সেই গন্ধ তব,
যেটুকু না দিবে তারে গন্ধ নাহি কব।'

শরৎ

আজি কী তোমার মধুর মূরতি হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ ঝলিছে অমল শোভাতে !
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল তোমার কাননসভাতে।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে, জননী, শরৎকালের প্রভাতে।

জননী, তোমার শুভ আহ্বান গিয়েছে নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিকো তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে পথে গন্ধ তাহার ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী, তোমার আহ্বানলিপি পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার করেছ সুনীলবরনি ;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে দিশি দিশি হতে তরণী !
আকাশ করেছ সুনীল অমল, স্নিগ্ধশীতল ধরণী !

বহিছে প্রথম শিশির সমীর   ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা   নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে, মাতা, কত আয়োজন—
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব   মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার   নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়   আয় তোরা সবে ছুটিয়া—
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,   অন্ন যেতেছে লুটিয়া।
ও পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে—
কে কাঁদে ক্ষুধায় জননী শুধায়,   আয় তোরা সবে জুটিয়া—
ভাণ্ডারদ্বার খুলেছে জননী,   অন্ন যেতেছে লুটিয়া।

মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য   গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত   শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে,
কুসুমভূষণজড়িত চরণে   দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে   হাসিছে নিখিল অবনী।

ফাল্গুন

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল,
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায়,
বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণবায়।
স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চরে।
নৌকা ডাঙায় বাঁধা, কাণ্ডারী জাগে—
পূর্ণিমারাত্রির মত্ততা লাগে।
খেয়াঘাটে ওঠে গান অশ্বত্থতলে,
পান্থ বাজায়ে বাঁশি আনমনে চলে।
ধায় সে বংশীরব বহুদূর গাঁয়,
জনহীন প্রান্তর পার হয়ে যায়।
দূরে কোন্ শয্যায় একা কোন্ ছেলে
বংশীর ধ্বনি শুনে ভাবে চোখ মেলে—
যেন কোন্ যাত্রী সে, রাত্রি অগাধ,
জ্যোৎস্না-সমুদ্রের তরী যেন চাঁদ।
চলে যায় চাঁদে চ'ড়ে সারা রাত ধরি,
মেঘেদের ঘাটে ঘাটে ছুঁয়ে যায় তরী।
রাত কাটে, ভোর হয়, পাখি জাগে বনে—
চাঁদের তরণী ঠেকে ধরণীর কোণে।

মাধবী

মাধবী হঠাৎ কোথা হতে
এল ফাগুন-দিনের স্রোতে—
এসে হেসেই বলে, 'যা ই যা ই যাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে, 'না না না!'—
নাচে তা ই তা ই তাই!

আকাশের তারা বলে তারে,
'তুমি এসো গগন-পারে,
তোমায় চা ই চা ই চাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে, 'না না না!'—
নাচে তা ই তা ই তাই।

বাতাস দখিন হতে আসে,
ফেরে তারি পাশে পাশে,
বলে, 'আ য় আ য় আয়।'
বলে, 'নীল অতলের কূলে
সুদূর অস্তাচলের মূলে
বেলা যা য় যা য় যায়।'

বলে 'পূর্ণশশীর রাতি
ক্রমে হবে মলিন-ভাতি,
সময় না ই না ই নাই।'
পাতারা ঘিরে দলে দলে
তারে কানে কানে বলে, 'না না না।'—
নাচে তা ই তা ই তাই।

ঈর্ষার সন্দেহ

লেজ নড়ে, ছায়া তারি নড়িছে মুকুরে—
কোনোমতে সেটা সহ্য করে না কুকুরে।
দাস যবে মনিবেরে দোলায় চামর
কুকুর চটিয়া ভাবে, এ কোন্ পামর!
গাছ যদি ন'ড়ে ওঠে, জলে ওঠে ঢেউ,
কুকুর বিষম রাগে করে ঘেউ-ঘেউ।
সে নিশ্চয় বুঝিয়াছে ত্রিভুবন দোলে
ঝাঁপ দিয়া উঠিবারে তারি প্রভু-কোলে।

মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুকুচুকু,
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তারি লেজটুকু।

যোগীনদা

যোগীনদাদার জন্ম ছিল ডেরাস্মাইলখাঁয়ে।
পশ্চিমেতে অনেক শহর অনেক গাঁয়ে গাঁয়ে
বেরিয়েছিলেন মিলিটারি জরিপ করার কাজে,
শেষ বয়সে স্থিতি হল শিশুদলের মাঝে।
'জুলুম তোদের সইব না আর' হাঁক চালাতেন রোজই,
পরের দিনেই আবার চলত ওই ছেলেদের খোঁজই।
দরবারে তাঁর কোনো ছেলের ফাঁক পড়বার জো কী—
ডেকে বলতেন, 'কোথায় টুনু ? কোথায় গেল খোঁকি ?'
'ওরে ভজু, ওরে বাঁদর, ওরে লক্ষীছাড়া'
হাঁক দিয়ে তার ভারী গলায় মাতিয়ে দিতেন পাড়া।

দিন ফুরোত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি ;
বেলের মালা হেঁকে যেত মোড়ের মাথায় মালী।
চেয়ে রইতেম মুখের দিকে শান্ত শিষ্ট হয়ে ;
কাঁসর ঘণ্টা উঠত বেজে গলির শিবালয়ে।
সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেক্‌ট্রিকের হয় নিকো উৎপত্তি।
ঘরের কোণে কোণে ছায়া ; আঁধার বাড়ত ক্রমে—
মিট্‌মিটে এক তেলের আলোয় গল্প উঠত জমে।
শুরু হলে থামতে তাঁরে দিতেম না তো ক্ষণেক ;
সত্যি মিথ্যে যা খুশি তাই বানিয়ে যেতেন অনেক।

ভূগোল হত উল্টোপাল্টা, কাহিনী আজগুবি—
মজা লাগত খুবই।
গল্পটুকু দিচ্ছি, কিন্তু দেবার শক্তি নাই তো
বলার ভাবে যে রঙটুকু মন আমাদের ছাইত।—

হুশিয়ারপুর পেরিয়ে গেল ছন্দৌসির গাড়ি,
দেড়টা রাতে সর্ হরোয়ায় দিল স্টেশন ছাড়ি।
ভোর থাকতেই হয়ে গেল পার
বুলন্দশর, আম্লোরিসর্সার।
পেরিয়ে যখন ফিরোজাবাদ এল
যোগীনদাদার বিষম খিদে পেল।
ঠোঙায়-ভরা পকৌড়ি আর চলছে মটর-ভাজা,
এমন সময় হাজির এসে জৌনপুরের রাজা।
পাঁচশো-সাতশো লোক-লস্কর, বিশ-পঁচিশটা হাতি—
মাথার উপর ঝালর-দেওয়া প্রকাণ্ড এক ছাতি।
মন্ত্রী এসেই দাদার মাথায় চড়িয়ে দিল তাজ;
বললে, 'যুবরাজ,
আর কতদিন রইবে, প্রভু, মতিমহল ত্যেজে!'
বলতে বলতে রামশিঙা আর ঝাঁঝর উঠল বেজে।

ব্যাপারখানা এই
রাজপুত্র তেরো বছর রাজভবনে নেই।

সত্ত ক'রে বিয়ে,
নাথ্‌দোয়ারার সেগুন-বনে শিকার করতে গিয়ে
তার পরে যে কোথায় গেল খুঁজে না পায় লোক ;
কেঁদে কেঁদে অন্ধ হল রানীমায়ের চোখ।
খোঁজ পড়ে যায় যেমনি কিছু শোনে কানাঘুষায় ;
খোঁজে পিণ্ডিদাদন্‌খাঁয়ে, খোঁজে লালামুসায়।
খুঁজে খুঁজে লুধিয়ানায় ঘুরেছে পঞ্জাবে ;
গুল্‌জারপুর হয় নি দেখা, শুনছি পরে যাবে।
চঙ্গামঙ্গা দেখে এল সরাই আলম্‌গিরে ;
রাওলপিণ্ডি থেকে এল হতাশ হয়ে ফিরে !

ইতিমধ্যে যোগীনদাদা হাৎরাশ জংশনে
গেছেন লেগে চায়ের সঙ্গে পাঁউরুটি-দংশনে।
দিব্যি চলছে খাওয়া,
তারি সঙ্গে খোলা গায়ে লাগছে মিঠে হাওয়া—
এমন সময় সেলাম করলে জৌনপুরের চর ;
জোড়হাতে কয়, 'রাজাসাহেব, কঁহা আপ্‌কা ঘর ?'
দাদা ভাবলেন সম্মানটা নিতান্ত জম্‌কালো,
আসল পরিচয়টা তবে না দেওয়াই তো ভালো।
ভাবখানা তাঁর দেখে চরের ঘনালো সন্দেহ—
এ মানুষটি রাজপুত্রই, নয় কভু আর-কেহ।

রাজলক্ষণ এতগুলো একখানা এই গায়,
ওরে বাস্ রে, দেখে নি সে আর-কোনো জায়গায়।

তার পরে মাস-পাঁচেক গেছে দুঃখে সুখে কেটে ;
হারাধনের খবর গেল জৌনপুরের স্টেটে।
ইস্টেশনে নির্ভাবনায় বসে আছেন দাদা—
কেমন করে কী যে হল, লাগল বিষম ধাঁধা।
গুর্খা ফউজ সেলাম ক'রে দাঁড়ালো চার দিকে,
ইস্টেশনটা ভরে গেল আফগানে আর শিখে।
ঘিরে তাঁকে নিয়ে গেল কোথায় ইটার্সিতে ;
দেয় কারা·সব জয়ধ্বনি উর্দুতে ফার্সিতে !
সেখান থেকে মৈনপুরী, শেষে লছমনঝোলায়
বাজিয়ে সানাই চড়িয়ে দিল ময়ূরপংখি দোলায়।
দশটা কাহার কাঁধে নিল, আর পঁচিশটা কাহার
সঙ্গে চলল তাঁহার।
ভাটিণ্ডাতে দাঁড় করিয়ে জোরালো দুর্‌বিনে
দখিন মুখে ভালো করে দেখে নিলেন চিনে
বিন্ধ্যাচলের পর্বত।
সেইখানেতে খাইয়ে দিল কাঁচা আমের সর্বত।
সেখান থেকে এক পহরে গেলেন জৌনপুরে
পড়ন্ত রোদ্দুরে।

এইখানেতেই শেষে
যোগীনদাদা থেমে গেলেন যৌবরাজ্যে এসে
হেসে বললেন, 'কী আর বলব, দাদা,
মাঝের থেকে মটর-ভাজা খাওয়ায় পড়ল বাধা।'
'ও হবে না' 'ও হবে না' বিষম কলরবে
ছেলেরা সব চেঁচিয়ে উঠল—'শেষ করতেই হবে।'

যোগীনদা কয়, 'যাক্‌গে,
বেঁচে আছি শেষ হয় নি ভাগ্যে।
তিনটে দিন না যেতে যেতেই হলেম গলদ্‌ঘর্ম।
রাজপুত্র হওয়া কি, ভাই, যে-সে লোকের কর্ম।
মোটা মোটা পরোটা আর তিন-পোয়াটাক ঘি
বাংলাদেশের হাওয়ায় মানুষ সইতে পারে কি ?
নাগরা জুতায় পা ছিঁড়ে যায়, পাগড়ি মুটের বোঝা—
এগুলি কি সহ্য করা সোজা ?
তা ছাড়া এই রাজপুত্রের হিন্দি শুনে কেহ
হিন্দি বলেই করলে না সন্দেহ।
যে দিন দূরে শহরেতে চলছিল রামলীলা
পাহারাটা ছিল সেদিন ঢিলা।
সেই সুযোগে গৌড়বাসী তখনি এক দৌড়ে
ফিরে এল গৌড়ে—

চলে গেল সেই রাত্রেই ঢাকা।
মাঝের থেকে চর পেয়ে যায় দশটি হাজার টাকা।
কিন্তু গুজব শুনতে পেলেম, শেষে
কানে মোচড় খেয়ে টাকা ফেরত দিয়েছে সে।'

'কেন তুমি ফিরে এলে' চেঁচাই চারি পাশে,
যোগীনদাদা একটু কেবল হাসে।
তার পরে তো শুতে গেলাম ; আধেক রাত্রি ধ'রে
শহরগুলোর নাম যত সব মাথার মধ্যে ঘোরে।
ভারত-ভূমির সব ঠিকানাই ভুলি যদি দৈবে
যোগীনদাদার ভূগোল-গোলা গল্প মনে রইবে।

ভিক্ষা ও উপার্জন

'বসুমতী, কেন তুমি এতই কৃপণা ?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি পাই শস্যকণা !
দিতে যদি হয় দে, মা, প্রসন্ন সহাস।
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস ?
বিনা চাষে, শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি ?'
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী—
'আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।'

নিষ্ফল উপহার

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছ শীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট, শ্যাম শিলাতল।
মাঝে গহ্বর, তাহে পশি জলধার
ছলছল করতালি দেয় অনিবার।

বরষার নির্ঝরে অঙ্কিতকায়
দুই তীরে গিরিমালা কত দূর যায়!
স্থির তারা, নিশিদিন তবু যেন চলে—
চলা যেন বাঁধা আছে অচল শিকলে।

মাঝে মাঝে শাল তাল রয়েছে দাঁড়ায়ে,
মেঘেরে ডাকিছে গিরি হস্ত বাড়ায়ে।
তৃণহীন সুকঠিন বিদীর্ণ ধরা,
রৌদ্রবরন ফুলে কাঁটাগাছ ভরা।

দিবসের তাপ ভূমি দিতেছে ফিরায়ে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে গিরি আপনার ছায়ে—
পথহীন, জনহীন, শব্দবিহীন।
ডুবে রবি যেমন সে ডুবে প্রতিদিন।

রঘুনাথ হেথা আসি যবে উতরিলা
শিখগুরু পড়িছেন ভগবৎ-লীলা।
রঘু কহিলেন, নমি চরণে তাঁহার—
'দীন আনিয়াছে, প্রভু, হীন উপহার।'

বাহু বাড়াইয়া গুরু শুধায়ে কুশল
আশিসিলা মাথায় পরশি করতল।
কনকে হীরকে গাঁথা বলয় দুখানি
গুরুপদে দিলা রঘু জুড়ি দুই পাণি।

ভূমিতল হতে বালা লইলেন তুলে,
দেখিতে লাগিলা প্রভু ঘুরায়ে আঙুলে।
হীরকের সূচীমুখ শতবার ঘুরি
হানিতে লাগিল শত আলোকের ছুরি।

ঈষৎ হাসিয়া গুরু পাশে দিলা রাখি,
আবার সে পুঁথি-'পরে নিবেশিলা আঁখি।
সহসা একটি বালা শিলাতল হতে
গড়ায়ে পড়িয়া গেল যমুনার স্রোতে।

'আহা আহা' চীৎকার করি রঘুনাথ
ঝাঁপায়ে পড়িল জলে বাড়ায়ে দু হাত।

আগ্রহে যেন তার প্রাণমনকায়
একখানি বাহু হয়ে ধরিবারে যায়।

বারেকের তরে গুরু না তুলিলা মুখ
নিভৃত হৃদয়ে তাঁর জাগে পাঠ সুখ।
কালো জল চুপে চুপে বহিল গোপন
ছল-ভরা সুগভীর চুরির মতন।

দিবালোক চলে গেল দিবসের পিছু,
যমুনা উতলা করি না মিলিল কিছু।
সিক্ত বসন লয়ে শ্রান্তশরীরে
রঘুনাথ গুরু-কাছে আসিলেন ফিরে।

'এখনো উঠাতে পারি' করজোড়ে যাচে—
'যদি দেখাইয়া দাও কোন্‌খানে আছে।'
দ্বিতীয় বলয়খানি ছুঁড়ি দিয়া জলে
গুরু কহিলেন, 'আছে ওই নদীতলে।'

সামান্য ক্ষতি

বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস,
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হতে দূরে গ্রামে নির্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শত সখী-সনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজ-শাসনে।
নিকটে যে-ক'টি আছিল কুটির
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর— কেবল পাখির
কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর-বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মানিক ঝলকি আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলি।
মৃণালভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী-সকলে
মহিষী কহিলা, 'উহু শীতে মরি,
সকল শরীর উঠিছে শিহরি—
জ্বেলে দে আগুন, ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে।'

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগল-পরানী
শাখা ধরি সবে করে টানাটানি,
সহসা সবারে ডাক দিয়া রানী
কহে সহাস্য-আননে—

'ওলো, তোরা আয়! ওই দেখা যায়
কুটির কাহার অদূরে।
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল।'
এত বলি রানী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে।

কহিল মালতী সকরুণ অতি—
'একি পরিহাস রানী মা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি—
এ কুটির কোন্ সাধু সন্ন্যাসী
কোন্ দীনজন কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা!'

রানী কহে রোষে, 'দূর করি দাও
এই দীনদয়াময়ীরে।'
অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে হূহু হুংকারি
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী—
ফণা নাচাইয়া অম্বর-পানে
মাতিয়া উঠিল গর্জনগানে ;
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপকরাগিণী।

প্রভাত-পাখির আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল—
দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তরবায়ু হইল প্রবল,
কুটির হইতে কুটিরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোটো গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী সাথে
ফিরে গেল রানী কুবলয় হাতে
দীপ্ত-অরুণ বসনা।

...

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়াছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদ্গদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সংকোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি উঠি গেল রাজা,
রক্তিমমুখ শরমে।
অকালে পশিলা রানীর আগার,—
কহিলা, 'মহিষী একি ব্যবহার
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বলো কোন্ রাজ-ধরমে।'

রুষিয়া কহিলা রাজার মহিলা,—
'গৃহ কহ তারে কী বোধে!
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটির,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর!
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে!'

কহিলেন রাজা উদ্যত রোষ
রুধিয়া দীপ্ত হৃদয়ে—
'যত দিন তুমি আছ রাজরানী
দীনের কুটিরে দীনের কী হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।'

রাজার আদেশে কিংকরী আসি
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া—
অরুণবরন অম্বরখানি
নির্মম করে খুলে দিল টানি,
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি
দিল রানী-দেহে তুলিয়া।

পথে লয়ে তারে কহিলেন রাজা
'মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে ক'টি কুটির হল ছারখার
যত দিনে পারো সে ক'টি আবার
গড়ি দিতে হবে তোমারে।

বৎসরকাল দিলেম সময়—
তার পরে ফিরে আসিয়া
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী,
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
জীর্ণ কুটির নাশিয়া।'

ভোরের পাখি

ভোরের পাখি ডাকে কোথায় ভোরের পাখি ডাকে !
ভোর না হতে ভোরের খবর কেমন করে রাখে !
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালীবরন পুচ্ছডোরের হাজার লক্ষ পাকে
ঘুমিয়ে পড়া বনের কোণে পাখি কোথায় ডাকে ?

ওগো তুমি ভোরের পাখি, ভোরের ছোটো পাখি,
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে মেলো তোমার আঁখি
কোমল তোমার পাখার 'পরে
সোনার রেখা স্তরে স্তরে,
বাঁধা আছে ডানায় তোমার উষার রাঙা রাখি।
ওগো তুমি ভোরের পাখি, ভোরের ছোটো পাখি!

রয়েছে বট, শতেক জটা ঝুলছে মাটি ব্যেপে—
পাতার উপর পাতার ঘটা উঠছে ফুলে ফেঁপে!
তাহারই কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়ে ছিলে পাখাতে মুখ ঝেঁপে,
যেখানে বট দাঁড়িয়ে একা জটায় মাটি ব্যেপে।

ওগো ভোরের সরল পাখি, কহো আমায় কহো—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে ঘুমিয়ে যখন রহ,
হঠাৎ তোমার কুলায়-'পরে
কেমন করে প্রবেশ ক'রে
আকাশ হতে আঁধার-পথে আলোর বার্তাবহ।
ওগো ভোরের সরল পাখি, কহো আমায় কহো।

কোমল তোমার বুকের তলে রক্ত নেচে উঠে,
উড়বে বলে পুলক জাগে তোমার পক্ষপুটে।
চক্ষু মেলি পুবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তোমার উৎস-সমান ছুটে।
কোমল তোমার বুকের তলে রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধার-মাঝে তোমার এতই অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে করে না প্রত্যয়।
তুমি ডাকো, 'দাঁড়াও পথে,
সূর্য আসেন স্বর্ণরথে,
রাত্রি ন য়, রাত্রি ন য়, রাত্রি ন য়, নয়।'
এত আঁধার-মাঝে তোমার এতই অসংশয়!

আনন্দেতে জাগো আজি আনন্দেতে জাগো!
ভোরের পাখি ডাকে যে ঐ, তন্দ্রা এখন না গো।
প্রথম আলো পড়ুক মাথায়
নিদ্রাভাঙা আঁখির পাতায়,
জ্যোতির্ময়ী উদয়-দেবীর আশীর্বচন মাগো।
ভোরের পাখি গাহিছে ঐ, আনন্দেতে জাগো।

প্রতিনিধি

অ্যাক্‌ওয়ার্থ্‌ সাহেব কয়েকটি মারাঠি গাথার যে ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহারই ভূমিকা হইতে বর্ণিত ঘটনা গৃহীত। শিবাজির গেরুয়া পতাকা 'ভগোয়া ঝেণ্ডা' নামে খ্যাত

বসিয়া প্রভাতকালে সেতারার দুর্গভালে
শিবাজি হেরিলা এক দিন—
রামদাস, গুরু তাঁর, ভিক্ষা মাগি দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন।
ভাবিলা, 'এ কী এ কাণ্ড! গুরুজির ভিক্ষাভাণ্ড!
ঘরে যাঁর নাই দৈন্যলেশ!
সবই যাঁর হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ!'
এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।
কহিলা, দেখিতে হবে কতখানি দিলে তবে
ভিক্ষা-ঝুলি ভরে একেবারে।
তখনি লেখনী আনি কী লিখি দিলা কী জানি
বালাজিরে কহিলা ডাকায়ে—

'গুরু যবে ভিক্ষা আশে আসিবেন দুর্গ-পাশে
এই লিপি দিয়ো তাঁর পায়ে।'

গুরু চলেছেন গেয়ে, সম্মুখে চলেছে ধেয়ে
কত পান্থ কত অশ্বরথ—
'হে ভবেশ, হে শংকর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছ শুধু পথ।
অন্নপূর্ণা মা আমার লয়েছে বিশ্বের ভার,
সুখে আছে সর্ব চরাচর—
মোরে তুমি হে ভিখারী, মার কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।'

সমাপন করি গান সারিয়া মধ্যাহ্নস্নান
দুর্গদ্বারে আসিলা যখন
বালাজি নমিয়া তাঁরে দাঁড়াইল এক ধারে,
পদমূলে রাখিয়া লিখন।
গুরু কৌতূহলভরে তুলিয়া লইলা করে,
পড়িয়া দেখিলা পত্রখানি—
বন্দি তাঁর পাদপদ্ম শিবাজি সঁপিছে অদ্য
তাঁরে নিজ রাজ্য-রাজধানী।

পরদিনে রামদাস গেলেন রাজার পাশ
কহিলেন, 'পুত্র, কহো শুনি,
রাজ্য যদি মোরে দেবে কী কাজে লাগিবে এবে—
কোন্ গুণ আছে তব গুণী ?'
'তোমারি দাসত্বে প্রাণ আনন্দে করিব দান'
শিবাজি কহিলা নমি তাঁরে।
গুরু কহে, 'এই ঝুলি লহো তবে স্কন্ধে তুলি
চলো আজি ভিক্ষা করিবারে।'

শিবাজি গুরুর সাথে ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে
ফিরিলেন পুরদ্বারে-দ্বারে।
নৃপে হেরি ছেলে মেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে
ডেকে আনে পিতারে মাতারে।
অতুল ঐশ্বর্যে রত তাঁর ভিখারীর ব্রত,
এ যে দেখি জলে ভাসে শিলা !
ভিক্ষা দেয় লজ্জাভরে, হস্ত কাঁপে থরোথরে
ভাবে ইহা মহতের লীলা।

দুর্গে দ্বিপ্রহর বাজে, ক্ষান্ত দিয়া কর্ম-কাজে
বিশ্রাম করিছে পুরবাসী।
একতারে দিয়ে তান রামদাস গাহে গান
আনন্দে নয়নজলে ভাসি—

'ওহে ত্রিভুবনপতি, বুঝি না তোমার মতি,
কিছুই অভাব তব নাহি—
হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির, প্রভু,
সবার সর্বস্ব-ধন চাহি!'

অবশেষে দিবসান্তে নগরের এক প্রান্তে
নদীকূলে সন্ধ্যাস্নান সারি
ভিক্ষা-অন্ন রাঁধি সুখে গুরু কিছু দিলা মুখে,
প্রসাদ পাইল শিষ্য তাঁরি।
রাজা তবে কহে হাসি, 'নৃপতির গর্ব নাশি
করিয়াছ পথের ভিক্ষুক ;
প্রস্তুত রয়েছে দাস— আরো কিবা অভিলাষ,
গুরু-কাছে লব গুরু দুখ।'

গুরু কহে, 'তবে শোন্, করিলি কঠিন পণ,
অনুরূপ নিতে হবে ভার—
এই আমি দিনু কয়ে মোর নামে মোর হয়ে
রাজ্য তুমি লহো পুনর্বার।
তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি,
রাজ্যেশ্বর দীন উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য লয়ে রবে রাজ্যহীন।'

'বৎস, তবে এই লহো মোর আশীর্বাদ-সহ
আমার গেরুয়া গাত্রবাস—
বৈরাগীর উত্তরীয় পতাকা করিয়া নিয়ো'
কহিলেন গুরু রামদাস।
নৃপশিষ্য নতশিরে বসি রহে নদীতীরে,
চিন্তারাশি ঘনায় ললাটে।
থামিল রাখাল-বেণু, গোঠে ফিরে গেল ধেনু,
পরপারে সূর্য গেল পাটে।

পুরবীতে ধরি তান একমনে রচি গান
গাহিতে লাগিল রামদাস—
'আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার-মাঝে
কে তুমি আড়ালে করো বাস?
হে রাজা, রেখেছি আমি তোমারি পাদুকাখানি,
আমি থাকি পাদপীঠতলে।
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই— আর কত বসে রই,
তব রাজ্যে তুমি এসো চলে।'

বৈরাগ্য

কহিল গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী,
'গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।
কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে ?'
দেবতা কহিলা, 'আমি।' শুনিল না কানে।

সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে
প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।
কহিল, 'কে তোরা, ওরে মায়ার ছলনা ?'
দেবতা কহিলা, 'আমি।' কেহ শুনিল না।

ডাকিল শয়ন ছাড়ি, 'তুমি কোথা প্রভু!'
দেবতা কহিলা, 'হেথা।' শুনিল না তবু।
স্বপনে কাঁদিল শিশু জননীরে টানি ;
দেবতা কহিলা, 'ফির।' শুনিল না বাণী।

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় ?'

বঙ্গজননী

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট-নেত্র আগুন-বরন।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ-তলে রৌদ্রবসনী !
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরাশি।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে !
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী।
তোমার অভয় বাজে হৃদয়-মাঝে, হৃদয় হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।

ভারতলক্ষ্মী

অয়ি ভুবনমনোমোহিনী!
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনকজননি-জননী!
নীলসিন্ধুজলধৌত চরণতল,
অনিলবিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিত ভাল' হিমাচল,
শুভ্রতুষারকিরীটিনী!
প্রথম প্রভাত-উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে,
জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী!
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী!

মায়ের সম্মান

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা-সাতটা গাড়ি ;
ছিল কুকুর, ছিল বেড়াল, নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছ-সাত জোড়া ;
দেউড়ি ভরা দোবে চোবে ছিল চাকর দাসী ;
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি ।—
আর ছিল এক মাসি ।

স্বামীটি তার সংসারে বৈরাগী,
কেউ জানে না গেছেন কোথায় মোক্ষ পাবার লাগি
স্ত্রীর হাতে তার ফেলে
বালক দুটি ছেলে ।
অনাত্মীয়ের ঘরে গেলে স্বামীর বংশে নিন্দা লাগে পাছে
তাই সে হেথায় আছে
ধনী বোনের দ্বারে ।
একটি মাত্র চেষ্টা যে তার কী করে আপ্‌নারে
মুছবে একেবারে ।
পাছে কারো চক্ষে পড়ে, পাছে তারে দেখে
কেউ বা ব'লে ওঠে 'আপদ জুটল কোথা থেকে',
আস্তে চলে, আস্তে বলে, সবার চেয়ে জায়গা জোড়ে কম—

সবার চেয়ে বেশি পরিশ্রম।

কিন্তু যে তার কানাই বলাই নেহাত ছোট্ট ছেলে—
তাদের তরে রেখেছিলেন মেলে
বিধাতা যে প্রকাণ্ড এই ধরা ;
অঙ্গে তাদের দুরন্ত প্রাণ, কণ্ঠ তাদের কলরবে ভরা।
শিশুচিত্ত উৎস-ধারা বন্ধ করে দিতে
বিষম ব্যথা বাজে মায়ের চিতে।
কাতর চোখে করুণ সুরে মা বলে 'চুপ চুপ'
একটু যদি চঞ্চলতা দেখায় কোনোরূপ।
ক্ষুধা পেলে কান্না তাদের অসভ্যতা ;
তাদের মুখে মানায় নাকো চেঁচিয়ে কথা ;
খুশি হলে রাখবে চাপি,
কোনোমতেই করবে নাকো লাফালাফি।
অপূর্ব আর পূর্ণ ছিল এদের একবয়সী ;
তাদের সঙ্গে খেলতে গেলে এরা হ'ত পদে পদেই দোষী !
তারা এদের মারত ধড়াধ্বড়,
এরা যদি উল্টে দিত চড়
থাকত নাকো গণ্ডগোলের সীমা—
উভয় পক্ষেরই মা
কানাই বলাই দোঁহার 'পরে পড়ত ঝড়ের মতো,
বিষম কাণ্ড হ'ত

ডাইনে বাঁয়ে দু ধার থেকে মারের পরে মেরে।
বিনা দোষে শাস্তি দিয়ে কোলের বাছাদেরে
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে মাসি
থাকত উপবাসী;
চোখের জলে বক্ষ যেত ভাসি।

অবশেষে দুটি ছেলে মেনে নিল নিজেদের এই দশা।
তখন তাদের চলা-ফেরা ওঠা-বসা
স্তব্ধ হল, শান্ত হল, হায়
পাখিহারা পক্ষীনীড়ের প্রায়।
এ সংসারে বেঁচে থাকার দাবি
ভাঁটায় ভাঁটায় নেবে নেবে একেবারে তলায় গেল নাবি;
ঘুচে গেল ন্যায়-বিচারের আশা,
রুদ্ধ হল নালিশ করার ভাষা।
সকল দুঃখ দুটি ভাইয়ে করল পরিপাক
নিঃশব্দ নির্বাক্।
চক্ষে আঁধার দেখত ক্ষুধার ঝোঁকে—
পাছে খাবার না থাকে আর পাছে মায়ের চোখে
জল দেখা দেয় তাই
বাইরে কোথাও লুকিয়ে থাকত, বলত 'ক্ষুধা নাই'।
অসুখ করলে দিত চাপা। দেব্‌তা মানুষ কারে
একটুমাত্র জবাব করা ছাড়ল একেবারে।

প্রথম যখন ইস্কুলেতে প্রাইজ পেল এরা
ক্লাসে সবার সেরা,
অপূর্ব আর পূর্ণ এল শূন্য হাতে বাড়ি।
প্রমাদ গণি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ি
মা ডেকে কয় কানাই বলায়েরে—
'ওরে বাছা, ওদের হাতেই দে রে
তোদের প্রাইজ দুটি।
তার পরে যা ছুটি
খেলা করতে চৌধুরীদের ঘরে!
সন্ধ্যা হলে পরে
আসিস ফিরে, প্রাইজ পেলি কেউ যেন না শোনে।'
এই ব'লে মা নিয়ে ঘরের কোণে
দুটি আসন পেতে
আপন হাতের খইয়ের মোওয়া দিল তাদের খেতে।

এমনি করে অপমানের তলে
দুঃখদহন বহন ক'রে দুটি ভাইয়ে মানুষ হয়ে চলে।
এই জীবনের ভার
যত হাল্কা হতে পারে করলে এরা চূড়ান্ত তাহার।
সবার চেয়ে ব্যথা এদের মায়ের অসম্মান—
আগুন তারই শিখার সমান

জ্বলছে এদের প্রাণ-প্রদীপের মুখে।
সেই আলোটি দোঁহায় দুঃখে সুখে
যাচ্ছে নিয়ে একটি লক্ষ্য-পানে—
জননীরে করবে জয়ী সকল মনে প্রাণে।

কানাই বলাই

কালেজেতে পড়ছে দুটি ভাই।
এমন সময় গোপনে এক রাতে
অপূর্ব তার মায়ের বাক্স ভাঙল আপন হাতে,
করল চুরি পান্নামোতির হার—
থিয়েটারের শখ চেপেছে তার।
পুলিস ডাকাডাকি নিয়ে পাড়া যেন ভূমিকম্পে নড়ে ;
যখন ধরা পড়ে-পড়ে
অপূর্ব সেই মোতির মালাটিরে
ধীরে ধীরে
কানাইদাদার শোবার ঘরে বালিশ দিয়ে ঢেকে
লুকিয়ে দিল রেখে।
যখন বাহির হল শেষে
সবাই বললে এসে—
'তাই না শাস্ত্রে করে মানা
দুধে কলায় পুষতে সাপের ছানা।

ছেলেমানুষ, দোষ কি ওদের, মা আছে এর তলে।
ভালো করলে মন্দ ঘটে কলিকালের ফলে।'

কানাই বলাই জ্ব'লে ওঠে প্রলয়বহ্নিপ্রায়,
খুনোখুনি করতে ছুটে যায়।
মা বললেন, 'আছেন ভগবান,
নির্দোষীদের অপমানে তাঁরই অপমান।'
দুই ছেলেরে সঙ্গে নিয়ে বাহির হলেন মাসি ;
রইল চেয়ে দোবে চোবে, রইল চেয়ে সকল চাকর দাসী,
ঘোড়ার সহিস, বেহারা চাপরাশি।

অপমানের তীব্র আলোক জ্বেলে
মাকে নিয়ে দুটি ছেলে
পার হল ঘোর দুঃখদশা চ'লে চ'লে কঠিন কাঁটার পথে।
কানাই বলাই মস্ত উকিল বড়ো আদালতে।
মনের মতো বউ এসেছে, একটি দুটি আসছে নাৎনি নাতি—
জুটল মেলা সুখের দিনের সাথি।
মা বললেন, 'মিটবে এবার চিরদিনের আশ—
মরার আগে করব কাশীবাস।'
অবশেষে একদা আশ্বিনে
পুজোর ছুটির দিনে

মনের মতো বাড়ি দেখে
দুই ভায়েতে মাকে নিয়ে তীর্থে এল রেখে।

বছর খানেক না পেরোতেই শ্রাবণ মাসের শেষে
হঠাৎ কখন মা ফিরলেন দেশে।
বাড়িসুদ্ধ অবাক সবাই। মা বললেন, 'তোরা আমার ছেলে
তোদের এমন বুদ্ধি হল অপূর্বকে পুরতে দিবি জেলে?'
কানাই বললে, 'তোমার ছেলে বলেই
তোমার অপমানের জ্বালা মনের মধ্যে নিত্য আছে জ্বলেই।
মিথ্যে চুরির দাগা দিয়ে সবার চোখের 'পরে
আমার মাকে ঘরের বাহির করে
সেই কথাটা এ জীবনে ভুলি যদি তবে
মহাপাতক হবে।'

মা বললেন, 'ভুলবি কেন? মনে যদি থাকে তাহার তাপ
তা হলে কি তেমন ভীষণ অপমানের চাপ
চাপানো যায় আর কাহারও 'পরে
বাইরে কিংবা ঘরে?
মনে কি নেই সেদিন যখন দেউড়ি দিয়ে
বেরিয়ে এলেম তোদের দুটি সঙ্গে নিয়ে
তখন আমার মনে হল আমি যদি স্বপ্নমাত্র হই,
জেগে দেখি আমি যদি কোথাও কিছুই নই—

তা হলে হয় ভালো।
মনে হল, শত্রু আমার আকাশ-ভরা আলো,
দেব্‌তা আমার শত্রু, আমার শত্রু বসুন্ধরা,
মাটির ডালি আমার অসীম লজ্জা দিয়ে ভরা!
তাই তো বলি, বিশ্ব-জোড়া সে লাঞ্ছনা
তেমন করে পায় না যেন কোনো জনা,
বিধির কাছে এই করি প্রার্থনা।’

ব্যাপারটা কী ঘটেছিল অল্প লোকেই জানে,
ব’লে রাখি সে কথা এইখানে।

বারো বছর পরে
অপূর্বরায় দেখা দিল কানাইদাদার ঘরে।
একে একে তিনটে থিয়েটার
ভাঙাগড়া শেষ ক’রে সে হল ক্যাশিয়ার
সদাগরের আপিসেতে। সেখানে আজ শেষে
তবিল-ভাঙার জাল হিসাবের দায়ে ঠেকেছে সে;
হাতে বেড়ি পড়ল বুঝি— তাই সে এল ছুটে
উকিল দাদার ঘরে, সেথায় পড়ল মাথা কুটে!
কানাই বললে, ‘মনে কি নেই?’ অপূর্ব কয় নতমুখে—
‘অনেক দিন সে গেছে চুকেবুকে।’
‘চুকে গেছে!’ কানাই উঠল বিষম রাগে জ্ব’লে—

'এত দিনের পরে যেন আশা হচ্ছে চুকে যাবে ব'লে।'

নীচের তলায় বলাই আপিস করে ;

অপূর্বরায় ভয়ে ভয়ে ঢুকল তারই ঘরে।

বললে, 'আমায় রক্ষা করো।'

বলাই কেঁপে উঠল থরোথরো।

অধিক কথা কয় না সে যে ; ঘণ্টা নেড়ে ডাকল দারোয়ানে।

অপূর্ব তার মেজাজ দেখে বেরিয়ে এল মানে মানে।

অপূর্বদের মা তিনি হন মস্ত ঘরের গৃহিণী যে ;

এদের ঘরে নিজে

আসতে গেলে হয় যে তাঁদের মাথা নত।

অনেক রকম ক'রে ইতস্তত

পত্র দিয়ে পূর্ণকে তাই পাঠিয়ে দিলেন কাশী।

পূর্ণ বললে, 'রক্ষা করো মাসি।'

এরই পরে কাশী থেকে মা আসলেন ফিরে।

কানাই তাঁরে বললে ধীরে ধীরে—

'জানো তো মা, তোমার বাক্য মোদের শিরোধার্য,

এটা কিন্তু নিতান্ত অকার্য।

বিধি তাদের দেবেন শাস্তি, আমরা করব রক্ষে,

উচিত নয় মা, সেটা কারো পক্ষে।'

কানাই যদি নরম হয় বা, বলাই রইল রুখে।

অপ্রসন্নমুখে।

বললে, 'হেথায় নিজে এসে মাসি তোমার পড়ুন পায়ে ধরে,

দেখব তখন বিবেচনা করে।'

মা বললেন, 'তোরা বলিস কী এ!

একটা দুঃখ দূর করতে গিয়ে

আরেক দুঃখে বিদ্ধ করবি মর্ম!

এই কি তোদের ধর্ম!'

এত বলি বাহির হয়ে চলেন তাড়াতাড়ি।

তারা বলে, 'যাচ্ছ কোথায়?' মা বললেন, 'অপূর্বদের বাড়ি।

দুঃখে তাদের বক্ষ আমার ফাটে,

রইব আমি তাদের ঘরে যতদিন না বিপদ তাদের কাটে।'

'রোসো রোসো, থামো থামো, করছ এ কী;

আচ্ছা ভেবে দেখি।

তোমার ইচ্ছা যবে,

আচ্ছা, নাহয় যা বলছ তাই হবে।'

আর কি থামেন তিনি?

গেলেন একাকিনী

অপূর্বদের ঘরে তাদের মাসি।

ছিল না আর দোবে চোবে, ছিল না চাপরাশি;

প্রণাম করল লুটিয়ে পায়ে বিপিনের মা, পুরোনো সেই দাসী।

আত্মত্রাণ

বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়!
সহায় মোর না যদি জুটে
নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।

আমারে তুমি করিবে ত্রাণ, এ নহে মোর প্রার্থনা—
তরিতে পারি শকতি যেন রয়।
আমার ভার লাঘব করি নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
বহিতে পারি এমনি যেন হয়।
নম্রশিরে সুখের দিনে
তোমারি মুখ লইব চিনে—
দুখের রাতে নিখিল ধরা যেদিন করে বঞ্চনা,
তোমারে যেন না করি সংশয়।

—

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষাপর্ষৎ - কর্তৃক অনুমোদিত
সপ্তম শ্রেণীর দ্রুতপাঠ্য কবিতা-সংকলন

মূল্য ০·৬৫ টাকা